স্মৃতির নোটবুক

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ঐতিহ্য

ধারাবাহিক এই স্মৃতিপুঞ্জ লিখেছিলাম ১৯৯৬ সালে। পরবর্তী-প্রণীত তিন-চারটি অংশ ভিতরে গুঁজে দিয়েছি। 'কণ্ঠস্বর'-সম্পৃক্ত রচনাটি অনেক আগের। যেমন, ষাটের দশকের লিটল ম্যাগাজিনের তালিকাটিও।

কবি আবিদ আজাদ পাণ্ডুলিপি দেখে এই আখ্যানমালার নাম দিয়েছেন 'স্মৃতির নোটবুক'। সংগত মনে হয়েছে নামটি। কেননা নিয়মিত কোনো ডায়েরি রাখিনি। কিছু নোট, স্মৃতির টুকরো, আমার অ-সংরক্ষণশীল ও এলোমেলো ভাঁড়ার থেকে পেয়ে-যাওয়া কয়েকটি পুরনো পত্রিকা ও বই :– মালমসলা ছিল এটুকুই মাত্র। আর আমার রচনারীতির লক্ষ্য ছিল বিস্তার নয়–সংক্ষেপীকরণ, সংযমন, আঁটো-করে-বাঁধা: কয়েকটি সরু রেখায় সেকালের সাহিত্যিক যাত্রাপথটিকে এঁকে যাওয়া। অনেক কিছু ভুলে গেছি। প্রতি বছর চৈত্রে যেমন পাতা উড়ে যায়, তেম্নি ঝরে গেছে অজস্র স্মৃতিচূর্ণ। তবু সেই বসন্তকাল শুধু পলাশ-অশোক-কৃষ্ণচূড়ারই ছিল না– ধুলোও ছিল, হঠাৎ-বৃষ্টিতে কাদাও! কে মনে রাখে সেসব? ঝলমলে রক্তিমতাই আজ বিজয়ী হয়ে জেগে আছে স্মৃতিপটে।

কেন্দ্রাংশ জখম না-করে রচনাশেষে 'সম্পূরণ' নামে কয়েকটি অংশ যোগ করেছি। কিন্তু স্মৃতির সম্পূর্ণতা কে কবে দিতে পেরেছে? একটি দিন-রাত্রি উদ্‌যাপনের পুনর্নির্মাণও কি সম্ভব? অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ মেনে নেওয়ার নামই জীবনযাপন– উত্তরপঞ্চাশে এই সত্য উপলব্ধি করেছি। কিন্তু ভুলচুকের দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে হবে। পরিশোধনের সুযোগ থাকলে সে-সব করা যাবে পরবর্তী সংস্করণে।

৫১ গ্রিন রোড, ঢাকা ১২০৫

আবদুল মান্নান সৈয়দ

কুলি রোড

বায়ান্ন বাজার আর তেপ্পান্ন গলির এই ঢাকা শহরে 'কুলি রোড' নামে কোনো রাস্তা কি খুঁজে পাবেন কেউ আজ? পাবেন না। কেননা রাস্তার নামটাই বদলে গেছে। এখন সেটা বিখ্যাত 'গ্রিন রোড'। এখন এক যন্ত্রযান-মানুষ-চঞ্চল রাস্তা। ষাটের দশকে এই রাস্তার নাম ছিল কুলি রোড। মুর্শিদ কুলি খাঁ-র নামে? নাকি অন্য কারো নামে? বা অন্য কারণে? আমি ঠিক জানি না। কল্পনা করা যাবে না, তখন কী ছিল এই রাস্তা! সারা বছর এক-হাঁটু ধুলোয় ডোবা। বর্ষাকালে প্যাচপেচে কাদা। গরুর গাড়ি চলত। দু-পাশে ধানখেত। অড়হর খেত। বিদ্যুৎ ছিল না। সন্ধের পরই ডুবে যেত অন্ধকারে। প্রচুর আম-কাঁঠাল গাছ ছিল রাস্তার দুধারে। বিশাল একটা বটগাছ। পলাশগাছ। শিমুলগাছ ছিল একটু ভেতর দিকে। শিমুলগাছের তুলো উড়ে উড়ে ছড়িয়ে যেত অনেক দূরে। বসন্তকালে পলাশগাছের পাতা একটা একটা করে ঝরে পড়ত। আর ন্যাড়া উঁচু গাছে দপদপ করত লালে-লাল পলাশ গাছটা। অনেক দূর থেকে চেনা যেত। মনে হতো, লাল একটা নিশান উড়ছে। শেয়াল ছিল। হঠাৎ হঠাৎ দেখা যেতো বিদ্যুতের মতো খরগোশ ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল তার মাটির খোড়লে। গরমের দুপুরবেলা নিঝুম হয়ে যেত। কাঠঠোকরা অবিশ্রাম গাছের গুঁড়ি ঠুকে যেত। কুলি রোডের মাঝামাঝি জায়গায় একটা খাল। বর্ষাকালে ভরে যেত পানিতে। নৌকো ভাসত অনেক। কাঠের পোল ছিল একটা। শীতকালে খাল শুকিয়ে যেত। এখন এটাই 'পান্থপথ' নামের রাস্তা। আমরা খালের ভেতরে নেমে যেতাম কাওরান বাজারে যেতে হলে। আম-কাঁঠাল আরও সব নানারকম গাছে আচ্ছন্ন ছিল আমাদের বাড়িটা। এ রাস্তার নাম-যে একদিন 'গ্রিন রোড' হবে তা ছিল অবধারিত। এলাকার নাম যে হবে 'কাঁঠালবাগান', তাও। কারণ এই সবুজের সমারোহ। এই সবুজই আমাকে কবি করেছে। গরমকালের দীর্ঘ দুপুরে হু-হু-করে-বয়ে-যাওয়া বাতাসে গাছের নিচে বিছানা পেতে শুয়ে বসে কবিতা লিখতাম। পাতা ঝরে যেত পারম্পর্যময়

শেকলের মতো। অনেক রাতে তেজগাঁ বা ফুলবাড়িয়া স্টেশনের দিকে চলে-যাওয়া ট্রেনের অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে আসত বাতাসে। এই দূরাগত রেলগাড়ির ধ্বনি শুনে একদিন 'শেষ নিশীথের ট্রেন' নামে কিশোর-আমি এক কবিতা লিখেছিলাম। আর, এক আশ্চর্য জ্যোৎস্নারাত্রির কথা মনে আছে আজও। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জানালা দিয়ে দেখেছিলাম, শরৎকালের দুধ-শাদা জ্যোৎস্না চারদিক দিনের আলোর মতো করে ফেলেছে। জ্যোৎস্নারাত্রির এরকম রূপ জীবনে দেখিনি আর-কখনো। সেই শাদা রাত্রি আজও আমার ভেতরে কোথাও জেগে আছে। চাঁদ আমার দেখার বাইরে, জানালার আড়ালে। শুধু অবিশ্রাম চাঁদের ঝরনা থেকে ঝরে পড়ছে দুধ-শাদা জ্যোৎস্না। তার সঙ্গে একটা-দুটো কালো পাতা, খয়েরি পাতা, সবুজ পাতা।

আমরা পাঁচজন

পঞ্চাশের দশকের গ্রাম থেকে ঢাকা শহর যখন ষাটের দশকে আধুনিক নগর হয়ে উঠতে চাচ্ছে, আমরা সেই সময়ের সন্তান। অশোক মিত্র যে-মফস্বল ঢাকা শহরের স্মৃতিতে অবিশ্রাম শিহরিত-আন্দোলিত, আমরা দেখেছি তার পরিবর্তমান মুহূর্তটি। কুলি রোডের 'গ্রিন রোড' হয়ে ওঠা। গ্রাম বা মফস্বল শহর থেকে আধুনিক নগর। পরবর্তীকালে নগর থেকে মহানগর হয়ে ওঠাও দেখেছি।

নাজিমউদ্দিন রোড থেকে ঢাকা কলেজ তখন সদ্য স্থানান্তরিত হয়েছে নীলখেতের অন্তসীমায় এসে। বাঁশের বেড়ার আর টিনশেডের তৈরি নীলখেত ব্যারাক থেকে আজিমপুরে স্থাপিত হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের জন্যে আজিমপুর কলোনি। তার পাশেই নিউমার্কেট তৈরি হচ্ছে। তার পাশেই ঢাকা কলেজ। অভিজাত ধানমন্ডি এলাকার প্রথম প্রবেশমুখে। ম্যাট্রিক পাস করে আমরা সেই কলেজে গিয়ে প্রবিষ্ট হলাম।

কলেজে যেমন হয়, ফার্স্ট ইয়ারের অনেক ছাত্রের মধ্যে সমমনা কয়েকজনের একেকটা দল গড়ে ওঠে, আমার ক্ষেত্রেও তেমনি হলো। এরকম একটি দল ছিল মেননদেরও (রাজনীতিবিদ রাশেদ খান মেনন)। ছিল রাজ্জাকেরও (রাজনীতিবিদ আবদুর রাজ্জাক)। আরও কিছু কিছু। লাজুক, নির্জন ও আত্মকেন্দ্রী আমার চেয়েও কেউ কেউ ছিল একেবারে একাকী। দলছুট। সহপাঠীদের কেউ কেউ আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষে

পৌঁছেছে। প্রশাসনের শিখরে অনেকে। যে পৌঁছয়নি, তারই কি কম মূল্য? উত্তরপঞ্চাশে এসে আজ কোনো সরলীকরণ করতে পারব না।

পাঁচজনের একটি দল তৈরি হয়ে গেল আমাদের। সিকানদার দারা শিকোহ, মফিজুল আলম, আমিনুল ইসলাম বেদু, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং আমি।

সিকানদার দারা শিকোহ ছিল আমার ছেলেবেলার স্কুলের বন্ধু। আমি ছিলাম নবাবপুর স্কুলের ছাত্র। সিকানদার এসে ক্লাস সেভেনে কি এইটে ভরতি হয়। গোলগাল, মোটাশোটা, ফরশা, সুদর্শন সিকানদার দারা শিকোহ কবি আবদুল কাদিরের বড় ছেলে। কাজী নজরুল ইসলাম তার নামকরণ করেছেন। কমরেড মুজফফর আহমদ তার নানা। সে নিজে কিন্তু জীবনানন্দের চেয়ে লাজুক ও নির্জন। আমি নিজেও তাই ছিলাম। তাহলেও আমার মধ্যে বোধহয় একটা সঙ্গকাতর মানুষও আছে। সিকানদার (বাড়িতে ওকে ডাকা হতো 'দারা' বলে) আর আমি দুজন ঘনিষ্ঠ হলাম– নির্জন দুজন কিশোরের যত ঘনিষ্ঠতা হয়, তার চেয়ে বেশি নয়। ঢাকা কলেজে উঠে সিকানদার গল্প করত সাহিত্যিকদের– কমরেড মুজফফর আহমদ, কাজী আবদুল ওদুদ থেকে আরও অনেকের। ওরা থাকত তখন আজিমপুর কলোনিতে। এই সময় সিকানদারের একমাত্র ভাই মুরাদ আজিমপুর পুকুরে ডুবে মারা যায়। সে সময় কয়েকবার গিয়েছি সিকানদারদের আজিমপুরের ফ্ল্যাটে। কবি আবদুল কাদিরকে তখনই আমি দেখি। আঁটো গেঞ্জি, লুঙ্গি-পরা স্বাস্থ্যবান পুরুষ। আমার আব্বা কী করেন, প্রথমেই জানতে চাইলেন। সে সময় তিনি ছিলেন সদ্য সন্তান হারানোর শোকে মোহ্যমান। সিকানদার সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা করত– কিন্তু নিজে খুব একটা লিখতে চাইত না। ঝোঁক ছিল প্রবন্ধ লেখার দিকে,– কিন্তু লিখত গল্প। 'মাহে-নও', 'সওগাত', 'পাকিস্তানী খবর' প্রভৃতি পত্রিকায় তার কিছু গল্প বা ইংরেজি থেকে অনূদিত রচনা বেরিয়েছিল। সিকানদার 'পাকিস্তানী খবর' সাপ্তাহিকে আমাকে নায়ক করে এক গল্প লেখে। কিছুকাল পরে আমি তা ফেরৎ দিই। 'পূবালী' পত্রিকায় তাকে নায়ক করে এক গল্প লিখি। ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর আমরা সবাই ভর্তি হয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। কিন্তু সিকানদার বাংলা বা ইংরেজিতে ভর্তি হলো না। আমাদের অবাক করে ঢুকল গিয়ে অর্থনীতিতে। মুরাদের মৃত্যুর পরে সিকানদারের কেমন যেন ধারণা হয়েছিল মুরাদের মৃত্যুর জন্যে তার

বন্ধুরাই দায়ী। সে নিজে ক্রমশ তার বন্ধুদের সম্পর্ক ছেড়ে দেয়। নতুন কোনো বন্ধুত্ব গড়ে তোলেনি। অনেকদিন অবধি এটা আমাদের এক বিচ্ছেদের বেদনা দিয়েছে। ছেড়ে দেয় লেখাও। সিকানদার এখন একটি সরকারি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক।

মফিজুল আলম ছিল তীব্র-তীক্ষ্ণ সাহিত্যবোদ্ধা। এন্তার বই কিনত। তখনো কলকাতার বইপত্র আসত খুব। মফিজুল আলম সেই বয়সেই সদ্যপ্রকাশিত বই মাত্রেই কিনে ফেলত। আর সাহিত্য ব্যাপারে ও ছিল প্রকৃত জহুরি। বাড়ি নোয়াখালিতে। দেশের বাড়িতে তার কয়েক আলমারি ঐ বয়সেই ভরে গিয়েছিল বই-এ। একবার দেশে গিয়ে– পরবর্তীকালে– মফিজ আলমারি খুলে দ্যাখে, তার সমস্ত বই উঁইয়ে খেয়ে ফেলেছে। ঢাকার বাড়িতে তার ছোট একাকী ঘরে বই ছিল অনেক। কিন্তু মূল সংগ্রহ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মনের দুঃখে সে বই কেনা চিরকালের মতো বাদ দেয়। মফিজকে আমরা ঠাট্টা করে বলতাম 'ঢাকা গেজেট'। ও সমস্ত খবরের কাগজ পড়ত– কোন খবরের কাগজ রাজনীতি বিষয়ে কী বলেছে, তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পছন্দ করত। স্বনামে ও 'শতদ্রু শোভন' নামে মফিজের কিছু কবিতা ও গদ্য 'স্বাক্ষর', 'সাম্প্রতিক' প্রভৃতি পত্রিকায় বেরিয়েছে। নতুন কিছু লেখার জন্যে তার একটি আকুলতা ছিল। তার সাহিত্যবিচারবোধে সবসময় আমার আস্থা আছে। আমার সাহিত্যকর্ম বিষয়ে তার সঙ্গে অনেক সময়ই আলাপ-আলোচনা করেছি। এবং এই তীক্ষ্ণনাসা তীক্ষ্ণচক্ষু অধুনা অধ্যাপক কৈশোর-বন্ধুর সাহিত্যবিশ্লেষণে উপকৃত হয়েছি।

লিখত বেদুও। সময় ও সাহিত্য এবং আরও দু-চারটি প্রবন্ধের বই লিখেছে আমিনুল ইসলাম বেদু। খুব অল্প বয়সেই। আমাদের সবার আগে তারই বই বেরোয়। পরবর্তীকালে আমরা সবাই মিলে 'সাম্প্রতিক' নামে যে-পত্রিকা বের করেছিলাম, বেদু-ই তা অনেকদিন পর্যন্ত চালিয়ে যায়। বাংলা ও ইংরেজি লিখনকর্মে বেদুর জুড়ি নেই। যদিও, অলস সে, আজকাল আর লিখতে চায় না। চট্টগ্রামী। আমরা যখন কলেজে, তখন ঢাকার নিউমার্কেট নতুন হয়েছে। এ ধরনের মার্কেট ঢাকা শহরে সেই প্রথম। এখন তো অসংখ্য। আমরা রোজই বিকেলবেলা নিউমার্কেটে বেড়াতে যেতাম। প্রধান উদ্দেশ্য : মেয়েদের দেখা। তখন ঢাকা শহর তো এত আধুনিক ও বিশাল ছিল না। রাস্তাঘাটে বেরোলেই এত মেয়েও দেখা যেত না। রোববার ছিল তখন ছুটির দিন। রোববারে মেয়েদের কিছু বেশি ভিড় হতো। ফলে রোববারটা আমরা নিউমার্কেটে যেতামই। এ বিষয়ে বেদু একটি এক লাইনের ছড়া বানিয়েছিল : 'রবিবার ছুটিবার দেখিবার দিন।' এই ছড়াটিও অদ্বিতীয়

বলা যেতে পারে, কেননা এটি এক লাইনের ছড়া। এবং এক লাইনেই যেহেতু বৃক্তব্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, কাজেই দ্বিতীয় পঙক্তির আর দরকার হয়নি। বেদু-রচিত আরেকটি মৌখিক ছড়াও মনে পড়ছে। তার প্রথম লাইনটি হলো : 'যেখানে দেখিবে নারী... ।' বাকি অংশ মুদ্রণযোগ্য নয় বলে বেদুর অসাধারণ ছড়ার এই একটি পঙক্তিই বাধ্য হয়ে উদ্ধৃত করতে হলো।

লেখার ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহ ও যত্নপরতা ছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং আমার। ইলিয়াস তখনো বড়দের লেখা ধরেনি। ছোটদের গল্প লিখত তখন। 'চোর' নামে তার একটি গল্প দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, মনে আছে। তখনই ইলিয়াসের কবিতায় কোনো আগ্রহ ছিল না, আগ্রহ ছিল কথাসাহিত্যে। যা তাকে পরবর্তীকালে বিপুল খ্যাতি ও সম্মান দিয়েছে। রোগা ফরশা মুখচোরা ইলিয়াস থাকত হোস্টেলে। মুখ-ভর্তি ব্রণ ছিল ওর। বেদু আর মফিজ প্রথমবার আই. এ. পাস করতে পারেনি। আমি আর ইলিয়াস একসঙ্গে বাংলায় ভর্তি হই। ইউনিভার্সিটিতে তার সঙ্গে জমে ওঠে আরও। দিনের পর দিন একসঙ্গে যাপন করতাম। পরের বছর পাস করে বেদু ও মফিজ বাংলা বিভাগেই ভর্তি হয়।

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের কমন-রুমে দেয়াল-পত্রিকার জন্যে একটা কবিতা লিখে দিয়েছিলাম। পত্রিকার নাম বা সম্পাদকের নাম আজ আর মনে নেই। মনে নেই ঐ কবিতার শিরোনাম বা একটি পঙক্তিও। 'ঢাকা কলেজ বার্ষিকী'তেই আমার প্রথম গল্প বেরোয়। নাম 'আকাশটা কালো'। বার্ষিকীর সম্পাদক ছিলেন তখনকার ঢাকা কলেজের বি.এ.র ছাত্র আখতার-উল-আলম। তিনি পরবর্তীকালে সাংবাদিক হিশেবে বিখ্যাত হন। পরে কূটনীতিবিদ। সাংবাদিকতায় ফিরে এসেছেন ফের।

আমরা তখন একটা ছাপা পত্রিকা প্রকাশ করার জন্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা করতাম। নামও ঠিক করা হয়েছিল। 'ময়ূখ'। শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি। কয়েক বছর পরে আমরাই (আমাদের আরও দুজন বন্ধু ও সহপাঠী সমেত) বের করেছিলাম আরেকটি পত্রিকা। 'সাম্প্রতিক'।

ঢাকা কলেজে আমাদের সহপাঠী ছিল আরও অনেকে। যেমন : আবদুল্লাহ আল মামুন। পরবর্তীতে বিখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার, টেলিভিশন কর্মকর্তা। 'ঢাকা কলেজ বার্ষিকী'-তে মামুন আর আমার গল্প একসঙ্গেই বেরিয়েছিল। মামুন তখন গল্প লিখত। ইউনিভার্সিটিতে উঠে সে ক্রমশ নাটকে

জড়িয়ে পড়ে–নাটকই হয়ে ওঠে তার ধ্যান-জ্ঞান। ছিল আমাদের বন্ধু ও সাহিত্য-সহচর জামাত আলি, পাস করে চাকরি করত অ্যাটোমিক এনার্জি অফিসে, বিজ্ঞান বিষয়ে লেখে মাঝে মাঝে– তখন আমিনুল ইসলাম বেদুর ছায়া-সহচর। ছিল শাহজাহান হাফিজ– আমার সহচর। শহীদুর রহমান (গল্পকার) ও মোহাম্মদ রফিক (কবি) আমাদের সঙ্গেই পড়ত– নাকি এক ধাপ নিচে। মোহাম্মদ রফিকের ডাক-নাম দিয়েছিল ইলিয়াস–পি. রফিক। ইলিয়াস এরকম নামকরণে ছিল ওস্তাদ। পি. রফিক পরে মুখে মুখে হয়ে যায় শুধু পি.। পি. বলেই বাইরেও অনেকে তাকে চিনত বা ডাকত। এমনকি ওর বউও। অনেকে এই পি.র মানে জানত না। ভাবত মোহাম্মদ রফিকের কোনো উপাধি। আসলে পি. মানে ছিল পাগলা।

প্রথম কিন্তু দ্বিতীয় পুরস্কার

আমরা যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র, তখন ইউনিভার্সিটি থেকে এক গল্প-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আয়োজক ছিল 'ওমেন্‌স্ হল' (বর্তমানে রোকেয়া হল)। কী মনে করে একটা গল্প পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। 'ঢাকা কলেজ বার্ষিকী'র ঐ 'আকাশটা কালো' গল্পটাই। তখন আমি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গল্পও লিখতাম খুব। সব 'সারপ্রাইজের' গল্প। তখনকার দিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা ছিল 'আজাদ'। হঠাৎ একদিন 'আজাদ' পত্রিকায় দেখলাম, আমার গল্পটি দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে। আমার জীবনের সেই প্রথম পুরস্কার। অসম্ভব আনন্দ পেলাম, সে তো বলা বাহুল্য। কিন্তু মুশকিল হলো এই, আমার পক্ষে পুরস্কার আনতে যাওয়া, এবং তাও মেয়েদের ভেতর থেকে, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

উদ্যোক্তিদের চিঠি পেয়ে সে কথা জানাতে, তাঁরা জানালেন, প্রথম পুরস্কার যিনি পেয়েছেন তিনি চট্টগ্রামবাসী, তিনি আসতে পারছেন না, কাজেই আমাকে যেতে হবে। এই নিয়ে চিঠি চালাচালি চলতে লাগল। এই পুরস্কার কমিটির আহ্বায়িকা বা সম্পাদিকা, যতদূর মনে পড়ছে, রফিকুন্নেসা তাঁর নাম, তাঁর সঙ্গে। আমি কিছুতেই যাব না– আর তিনি অনুরোধ করে চলেছেন। পত্রবাহক ছিল সম্ভবত ওমেন্‌স্ হলের দারোয়ানদের কেউ। তাকে অনেকবার আসতে হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত যেতে হলো আমাকে।

কার্জন হলে অনুষ্ঠান। আমি যখন পৌঁছেছি, তখন কার্জন হল মিলনায়তনে উপচে-পড়া ভিড়। বাইরেও ভিড়। গাড়ি। আর ভিড়ে থইথই করছে সুবেশিনী সুদর্শনা ঝলমলে মেয়েরাই। শীতকাল হলেও ঘামছি। আমার নাম ঘোষণা হতেও পা সরে না। কে একজন মেয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল মঞ্চে। উপাচার্যের হাত থেকে পুরস্কার নিলাম। তারপর বেশি দেরি না-করে ফিরে এলাম বাড়িতে।

পুরস্কারের নাম ছিল 'ইমাম স্মৃতি পুরস্কার'। পরবর্তীকালে অন্যদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, পুরস্কারটি অধ্যাপিকা আখতার ইমামের মরহুম স্বামীর নামে ঘোষিত হয়েছিল। আর উপাচার্য ছিলেন সম্ভবত হামুদুর রহমান।

কী ছিল সেই পুরস্কার?– বিমল মিত্রের অসাধারণ উপন্যাস 'সাহেব বিবি গোলাম'। আর একটা সার্টিফিকেট। এর কোনোটাই আজ আর আমার কাছে নেই। কিন্তু সেই আনন্দস্মৃতি কি মুছবার? পথ চলবারও অনেক প্রেরণা দিয়েছে।

ঢাকা কলেজ

ঢাকা কলেজ তখন এদেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ। জ্যোতিষ্কে-নক্ষত্রে ঝলমল করছে। অধ্যক্ষ ছিলেন এম. ইউ. আহমদ। শরীর কৃশ কিন্তু মেধায় তীক্ষ্ণ। মনস্তত্ত্ববিদ হিশেবে মুসলেহউদ্দিন আহমদের প্রসিদ্ধি ছিল। উপাধ্যক্ষ ছিলেন শফিকুর রহমান। ইংরেজি বিভাগে ছিলেন আবু রুশদ, মোহাম্মদ নোমান, কবীর চৌধুরী প্রমুখ। আবু রুশদ চিরকালের মতোই তীক্ষ্ণ, তির্যক, পরিমিত। কবীর চৌধুরী বোধহয় ঢাকা কলেজ থেকেই অধ্যক্ষ হিশেবে চলে যান বরিশাল বি.এম. কলেজে। মোহাম্মদ নোমানের একটি সনেট সম্ভবত ঢাকা কলেজ বার্ষিকীতে বেরিয়েছিল। তাঁর লেখা আরও দুএকটি সনেট এদিক-ওদিক দেখেছি। পরবর্তীকালে আমার এই তিনজন অধ্যাপকেরই সস্নেহ সহৃদয়তা পেয়েছি। ইংরেজি বিভাগে আরও একজন অধ্যাপক ছিলেন– এনামুল হক। এখন আমেরিকায়। তিনি আমার কাঁচা ইংরেজি লেখা পড়েও জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কবিতা লিখি কিনা। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মীর আনোয়ার আলী ও নূরুল করিম এবং অর্থনীতির আজহারুল ইসলামের

কথা মনে আছে। অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন উর্দুভাষার একজন খ্যাতিমান কবি, ইকবাল আজিম, সম্ভবত উর্দু বিভাগে। বাংলা বিভাগ আলো করে ছিলেন শওকত ওসমান, হিশামুদ্দীন আহমদ, ইদরিস মিয়া, আবদার রশীদ, আবদুল লতিফ চৌধুরী, মুহম্মদ নিজামুদ্দীন, রওশন আরা রহমান প্রমুখ। আমার অগ্রজরাও ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিল। তাদের শিক্ষক ছিলেন কবি আশরাফ সিদ্দিকী। আমরা যখন ঢাকা কলেজে, তখন তিনি বিদেশে গেছেন। ফলে আশরাফ সিদ্দিকী আমার শিক্ষক নন অল্পের জন্যে– যদিও পরবর্তীকালে সাহিত্যসূত্রে তাঁর সস্নেহ সংস্পর্শে এসেছি। অধ্যাপক আবদুল আউয়াল আমাদের একটি ক্লাস নিয়েই ঢাকার বাইরে বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তখন বোধহয় এল-পি-আরে গেছেন। আমাদের 'স্পেশাল বেঙ্গলি'র ক্লাসে তিনি একদিন এসেছিলেন। তখন কে যেন ক্লাস নিচ্ছিলেন। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন 'আজাদ'-'মোহাম্মদী'-র আরবি-ফারসি-মেশানো বাংলা নিয়ে বিদ্রুপ করেছিলেন। অদ্ভুত লেগেছিল মনসুরউদ্দীন স্যারের প্রলম্বিত দাড়ি, বেশবাস, হাসি, কথাবার্তা এবং কণ্ঠস্বর। তার কণ্ঠস্বর একবার বহু উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল,তারপরই নেমে যাচ্ছিল একেবারে খাদে– আর শোনা যায় না এরকম ফিসফিস উচ্চারণ; পরমুহূর্তে আবার হয়তো ভৈরব গর্জন। পরে দেখেছি, এটা স্যারের অভ্যাস। হিশামুদ্দীন স্যার পড়াতেন মোজাম্মল হকের 'জোহরা' উপন্যাস– যা শেষপর্যন্ত একটি বা দুটি অধ্যায়ের বেশি অগ্রসর হয়নি। শওকত ওসমান স্যার তা-ও করেননি, শওকত ওসমান স্যার কী বই পাঠ্য, তাও সম্ভবত খোঁজ করেননি কখনো। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতেন তিনি। যেমন : একটা মনে আছে। তিনি একটা অদ্ভুত বাড়ি বানানোর স্বপ্ন দেখতেন– যার ছাদ টিনের বাড়ির ছাদের মতো দুদিকে ঢালু হবে না কিংবা সমতল হবে না, হবে মাঝখানে নিচু। বর্ণনার চেয়ে স্যারের পরিকল্পিত বাড়ির ছবি এঁকে দেখানো ভালো। সাধারণত টিনের বাড়ি হয় ত্রিভুজ ওপরদিকে উঁচু করে আঁকলে যেমন হয় তেমনি, কিন্তু শওকত ওসমানের পরিকল্পিত টিনের বাড়ির ছাদ ত্রিভুজ উল্টে দিলে যেমন হবে সে-রকমের। স্পেশাল বেঙ্গলি-র ক্লাস হতো ক্লান্ত দীর্ঘ গরমের দুপুরবেলায়। তখন স্বভাবতই স্বপ্ন এসে দেখা দিত।

কিন্তু শওকত ওসমান অ-পাঠ্য বিষয়ে বলেই আমাদের জ্ঞানের ও কল্পনার চোখ খুলে দিয়েছিলেন।

হিশামুদ্দীন স্যারের একটা মন্তব্য আমাকে চিরকাল প্রেরণা দিয়েছে। ইলিয়াস হোস্টেলে থাকত। স্যার ঐ হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আমার পরীক্ষার খাতা দেখে স্যার ইলিয়াসকে আমার সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'ওকে লেখালেখি চালিয়ে যেতে বোলো। তোমাদের আগের ছাত্র মনজুরে মওলা (পরবর্তীকালে কবি-সমালোচক এবং আমলা হিশেবে খ্যাতিমান)-র লেখাও খুব ভালো। মওলার লেখায় ছিল ভার, এর লেখায় আছে ধার।' ইলিয়াসই আমাকে স্যারের এই মন্তব্য জানায়। বাংলা পরীক্ষার খাতা দেখে কয়েকশো ছাত্রের মধ্যে অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরীও চিহ্নিত করেছিলেন দুজনকে– আমাকে এবং উত্তরকালে সরকারি উচ্চ কর্মকর্তা ডক্টর শাহ মুহম্মদ ফরিদকে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে এ স্যারদের সঙ্গে দেখা হয়নি আর কখনো। কিন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ আমার খোঁজ-খবর রাখতেন, তা জানি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আর্ট কলেজ কিছুকাল হলো স্থাপিত হয়েছে। শালপ্রাংশু মহাধ্বজ জয়নুল আবেদিনকে একদিন দেখলাম আর্ট কলেজের দরোজায় দাঁড়িয়ে। একাকী। ঐসব অঞ্চল তখন নিঝুম। তিনি আমার দিকে তাকালেন। এই ছবিটা আমার ভেতরে ফ্রেমে বাঁধানো। ম্যাট্রিক পাস করার পরে আমার ইচ্ছা ছিল আর্ট কলেজে পড়ার। আম্মাও রাজি ছিলেন। আব্বা বললেন: খাওয়া জুটবে না। সুতরাং ঐ দূর থেকে দেখাই সার হলো।

কিন্তু আই.এ. পাস করার পরে যখন বাংলায় পড়তে চাইলাম, আব্বা বাধা দিলেন না। আমার যা রেজাল্ট ছিল, যে-কোনো বিষয়ে ভর্তি হতে পারতাম। কিন্তু আমার আবাল্য অসম্ভব আকর্ষণ ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রতি। কলেজে পড়ার সময় প্রতিদিন পাবলিক লাইব্রেরিতে (এখন যেটা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি) যেতাম দুপুরবেলা। এটা-ওটা-সেটা– কী-না পড়তাম। আমার ধারণা ছিল, বাংলা সাহিত্যের সমস্তই বোধহয় অধিগত হয়ে গেছে। সে-ধারণা ভেঙে যায় বাংলা পড়তে গিয়ে। ধারাবাহিক একাডেমিক শিক্ষার ফলই আলাদা। এর ফলে বাংলা সাহিত্যের কোনো টুকরোনো-খামচানো ধারণা থেকে অন্তত মুক্ত থাকতে পেরেছি। আম্মার খুব ইচ্ছা ছিল, পরে ইংরেজিতে এম. এ. করি। সে আর হয়নি। ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি বাংলা

সাহিত্যের চর্চার জন্যে বিধিবদ্ধ শিক্ষা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র হিশেবে যেভাবে অর্জিত হয়, অন্যভাবে তা কঠিন। পাকিস্তান আমলে মুসলমান তরুণদের মধ্যে তখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ধুম পড়ে গেছে। আমার বড় ভাইও ডাক্তারি পড়ছিল, মেজো ভাই আর আমি আর্টসে– এটাই আম্মার খুব আক্ষেপ ছিল, প্রায়ই খেদ করতেন এই নিয়ে। মেজোভাই তাও ইকনমিক্সে– আর্টসের মধ্যে যে-বিষয়টার বাজারদর ছিল তখন সবচেয়ে বেশি; আর আমি পড়ছি কিনা বাংলায়– যে বিষয়টা সবচেয়ে ওঁচা, যা পড়ে মেয়েরা। আব্বার কাছে আজ কৃতজ্ঞ মনে হয় নিজেকে, আমার প্রিয় বিষয়ে তিনি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। আব্বা যে ভুল করেননি, তা তিনি দেখে গিয়েছেন। আর আম্মারও আজ এ বিষয়ে তিলমাত্র খেদ নেই।

আমাদের সময়ে বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। অন্যরা : মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহিম, কাজী দীন মুহম্মদ, আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া প্রমুখ। আমার শিক্ষক-ভাগ্য চিরকালই ভালো। দেশখ্যাত অধ্যাপকবৃন্দকে আমি পেয়েছিলাম। সাবসিডিয়ারি বিষয় ছিল আমার দর্শন আর ইতিহাস। তখন সাইকোলজি আলাদা কোনো বিভাগ ছিল না। গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। ইতিহাস পড়াতেন সন্তোষ ভট্টাচার্য আর গিয়াসুদ্দীন আহমদ। গোবিন্দ দেব, সন্তোষ ভট্টাচার্য ও গিয়াসুদ্দীন আহমদ– তিনজনই ১৯৭১এ মুক্তিযুদ্ধের সময় শহিদ হয়েছিলেন। আমাদের সময়ে 'ফাংশানাল ইংলিশ' পড়তে হতো। আমার অধ্যাপক ছিলেন খান সারওয়ার মুরশিদ। আমাদের সময়ে, শুধু আমাদের সময়েই, প্রবর্তিত হয়েছিল (নিশ্চিত কোনো শিক্ষাভিমানী বিশেষজ্ঞের উর্বর মস্তিষ্কজাত পরিকল্পনা!) একশো নম্বরের বিজ্ঞানশিক্ষা যে-কোনো বিষয়ের অনার্সের ছাত্রের জন্যে বাধ্যতামূলক। ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা বিজ্ঞান ক্লাস করার জন্যে রীতিমত ছুট লাগাতাম কার্জন হলের দিকে। আমার একজনমাত্র, বিজ্ঞান-শিক্ষকের কথা মনে আছে। পক্ষীবিশারদ কাজী জাকির হোসেন– আমাদের সালিম আলি।

তখনকার ইউনিভার্সিটি ছিল মেডিকেল কলেজের দক্ষিণ প্রান্তাংশটুকু মাত্র। একতলায় লাইব্রেরি। দোতলায় ক্লাস হতো। বাংলা ডিপার্টমেন্ট ছিল নিচের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের কয়েকটি একতলা ঘর। মাঝে মাঝে পশ্চিম দিকের দেয়াল পেরিয়ে ট্রেন তেজগাঁ বা ফুলবাড়িয়ার দিকে চলে যেত। ছোট হলে কী হবে, কী যে সুন্দর ছিল ইউনিভার্সিটি এলাকা। জহির রায়হানের,

বাংলা বিভাগে আমাদের অগ্রজ, কখনো আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, এক গল্পগুচ্ছের নাম ছিল 'ইউক্যালিপটাস এভিনিউ'। গল্পগুলো ছিল বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক। 'মৃদঙ্গ' নামের একটি অল্পস্থায়ী বিনোদক-পত্রিকায় বেরিয়েছিল। ইউক্যালিপটাস এভিনিউ আমাদের ঐ ইউনিভার্সিটির সামনের রাস্তার নাম। এখনো সেইসব শাদা খাড়া আকাশ-অভিমুখী রোমান থামের দু-একটি অবশিষ্ট আছে ঐ এলাকায়।

আমার শিক্ষকরা প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ। আবু হেনা মোস্তফা কামাল আমার মাত্র এক পিরিয়ডের শিক্ষক। কিন্তু ঐ এক পিরিয়ডেই আমাকে শুদ্ধু আমাদের সবাইকে তিনি কিনে নিয়েছিলেন। কবি জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে ওরকম অসাধারণ বিশ্লেষণ শুনিনি আর। রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া পড়াতেন পালি, সদ্য বিদেশ থেকে ফিরেছেন, ক্লাসে সে-সব গল্প করতেন, মানুষটি ছিলেন শিশুর চেয়ে সরল। ছন্দ পড়াতেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শান্তিনিকেতনী পরিশুদ্ধ পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর আচরণে অবয়বে সর্বত্র। মুনীর চৌধুরী ছিলেন তখনি দেশবিখ্যাত, অনেক বিষয়ে দক্ষ, এমনকি তাঁর সিনেমায় অভিনয়েরও খবর তখনকার দিনের অতিজনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'চিত্রালী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল একবার। টিউটোরিয়াল ছিল আমার সঙ্গে। সামনে ঝুড়ি-অলা এক সাইকেলে চড়ে আসতেন ইউনিভার্সিটিতে। যে-দিন রীতিমত সকালে স্যারের সঙ্গে টিউটোরিয়াল থাকত দেখতাম বেরুচ্ছেন লাইব্রেরি থেকে, অর্থাৎ রীতিমত পড়াশোনা করতেন। স্যারকে নিউমার্কেটের বাজারে দেখতাম, পরবর্তীকালে ছুটির দিনে দেখেছি তাঁর গাড়ি থেকে ছিপ বেরিয়ে আছে– মাছ ধরতে বেরিয়েছেন– অর্থাৎ পুরোপুরি জীবনরসিক। আমাদের পড়াতেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'রাজসিংহ'-র প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ– কিন্তু হাসতেন এই বলে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো এত বড় শিল্পী কেন-যে মুসলিম-বিদ্বেষী হয়ে খামোখা নিজেকে ছোট করলেন! সাইকেল চড়ে আসতেন আমাদের বিভাগীয় প্রধান মুহম্মদ আবদুল হাই-ও। হাই শাহেব ছিলেন শান্ত সংযত মৃদুভাষী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়াতেন। তাঁর প্রিয় কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-র নামে সদ্যস্থাপিত 'বলাকা' সিনেমা হলের নামকরণ স্যারই করেছিলেন। ধ্বনিতত্ত্বের মতো জটিল বিষয় তাঁর আলোচনায় ছবির মতো ফুটে উঠত। বাংলা বিভাগের মেধাবী ছাত্রদের কথা সগর্বে বলতেন– হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ-দের নাম করতেন। ১৯৬৮-৬৯ সালের দিকে আমি তখন সিলেটের এম. সি. কলেজের অধ্যাপক, বাংলা একাডেমিতে একুশের অনুষ্ঠানে শেষবার যখন দেখা হলো, লেখক হিশেবে তখন আমার

কিছু নাম-ডাক হচ্ছে, দেখেছি স্যারের চোখে ছাত্রের কৃতিত্বে উজ্জ্বলতা। বর্তমানে জীবিত ইউনিভার্সিটির অন্য সব আমার শিক্ষককে মনে হয় প্রত্যেকে তাঁর স্ব-ক্ষেত্রে তুলনাহীন।

কিন্তু ইউনিভার্সিটি কোনো ইমারত না। আমার অধ্যাপকদের শিক্ষা, লাইব্রেরি, ইউক্যালিপটাস, কৃষ্ণচূড়া এবং একগুচ্ছ তরুণ-তরুণী আমার দরোজা খুলে দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যার দিকে– বিরাট বিশ্বের দিকে।

'মাসিক মোহাম্মদী'

ঢাকা কলেজে থাকতেই আমি প্রথম আত্মপ্রকাশ করি লেখক হিশেবে। কলেজের কমনরুমে টাঙিয়ে-দেওয়া এক হাতে-লেখা পত্রিকায় আমার কবিতা বেরিয়েছিল। ওখানে থাকতেই ছাপার হরফে আমার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর সাহিত্য-সাময়িকীতে। ডাকে পাঠিয়েছিলাম। কবিতার নাম 'সোনার হরিণ'। আজ মনে হয়, জীবনভোর এক সোনার হরিণের পেছনেই ছুটে চলেছি! রামচন্দ্রের মতোই এ জীবনে তাকে ধরতে পারলাম না। 'ঢাকা কলেজে বার্ষিকী'তে গল্প ছাপা হয়েছিল। ছাপার হরফে আমার প্রথম গল্প, 'আকাশটা কালো'। এই গল্পটিই ঢাকা ইউনিভার্সিটির তখনকার দিনের একমাত্র মেয়েদের হল-এর এক গল্প-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জয় করে এনেছিল।

তখনো ঢাকায় নাটক করার রেওয়াজ ছিল। ছোটবেলা পাড়ায় নাটক হতে দেখেছি, স্কুলে দেখেছি, মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে তো হতোই। এখন আর সে-সব নেই। এখন নাটক আর সার্বজনীন নেই। বেইলি রোডে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। গ্রিন রোডে আমাদের পাড়াতেও বছর বছর নাটক হয়েছে। আমরা যখন গোপীবাগে ছিলাম, পঞ্চাশের দশকে, তখন তো হরদম নাটক হতোই। ঢাকা কলেজেও তখন বার্ষিক নাটক হতো। একবার এসেছিলেন, পরবর্তীকালের খ্যাতনাম্নী, চলচ্চিত্রাভিনেত্রী আনোয়ারা। ছাত্রমহলের একাংশে তার নাম গুঞ্জরিত হচ্ছিল, মনে আছে।

ঢাকার তখন সাংস্কৃতিক বিষয়টা টেলিভিশনেই কেন্দ্রীভূত হয়নি। মনে আছে, আমাদের কলেজে একবার মমতাজ আলী খান (উত্তরকালের খ্যাতনাম্নী গায়িকা পিলু মমতাজের বাবা) গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। আর-একবার আমাদের ক্লাসে এসেছিলেন কথাসাহিত্যিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। বো-টাই-পরা ফরশা সিনেমার নায়কের মতো সুদর্শন শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের

চেহারা দাগ কেটে গিয়েছিল। যদিও তাঁর বক্তৃতার কোনো কথাই মনে নেই আজ আর। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে 'মুক্তধারা'-র অফিসে। চিত্তদা, চিত্তরঞ্জন সাহা, আলাপ করিয়ে দিলেন। একজন কথাসাহিত্যিকের কোনো মন্তব্যে তিনি আহত হয়েছেন, মনে হলো। বহু বছর থেকে তিনি প্রবাসী, ইতালিতে থাকেন। সময়ের নিয়মে তাঁর যৌবনের সেই অনিন্দ্যসুন্দর চেহারাও তখন বদলে গেছে।

আমার সেই সাহিত্যে প্রথম প্রবেশের সময় যে-পত্রিকাটিতে আমি সবচেয়ে বেশি যুক্ত হয়েছিলাম, তা বাঙালি-মুসলমানের আধুনিকতার অন্যতম অগ্রদূত, 'মাসিক মোহাম্মদী'। তখনো মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র নামই সম্পাদক হিশেবে ছাপা হচ্ছে। কিন্তু তখন আর তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন না। সেই সময় পত্রিকা দেখাশোনা করতেন খুব সম্ভবত আখতার-উল-আলম। 'মাসিক মোহাম্মদী'তে তিনি আমার কয়েকটি লেখা ছেপেছিলেন। সম্ভবত পরে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী 'আজাদ'-'মোহাম্মদী'-তে যুক্ত হয়েছিলেন। সেখান থেকে গিয়েছিলেন দৈনিক 'পূর্বদেশে'।

'মোহাম্মদী'তে লেখা ছাপার কয়েকটি সুফল ছিল সে-সময়। দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকা সে-সময় ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা। প্রত্যেক মাসে 'আজাদ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনে 'মোহাম্মদী'র সম্পূর্ণ সূচিপত্র ছাপা হতো। আর সে সময় কে-ই-বা টাকা দিত! বিশেষত আমার মতো নতুন লেখককে। কিন্তু টাকা আনার জন্যে যে-পরিশ্রম হতো, তা অকল্পনীয়। ২০/২৫ টাকার জন্যে ২০/২৫ বার যেতে হতো। 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী'তে তখন অ্যাকাউনট্যান্ট ছিলেন সাহিত্যিক জগলুল হায়দার আফরিক। বিরামহীন যাতায়াত না-করলে তিনি কখনো টাকা দিতেন না। তাঁর নাম ছিল যেমন 'বিচিত্র' (নিশ্চয় ছদ্মনাম), তেম্নি তাঁর একটি সেকালে বিখ্যাত ও পুরস্কার-পাওয়া বইএর নামও ছিল অদ্ভুত। 'সিন্ধু নীলাব দেশে'। নীলা-র না কিন্তু–নীলাব। র নয়–ব। 'আজাদে' প্রায়ই এই বইটার বড় বড় বিজ্ঞাপন বেরোত। নিশ্চিতভাবে তাঁর ঐ পত্রিকার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার প্রতাপে।

সে সময়ে 'মোহাম্মদী'-তে অনেকের লেখাই বেরোত। আমার সমকালীন দুএকজন লেখকের কথা মনে আছে। কিছুকাল আগে মৃত, সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন 'মোহাম্মদী'তে তখন খুব লিখতেন। গল্প-উপন্যাস। দু-হাতে গল্প-উপন্যাস লিখতেন জিয়া আনসারী (উত্তরকালে টি-ভি প্রযোজক)। পাশাপাশি দু-একবার কবিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম মীর আবুল খায়ের এবং